সিলেট কন্যার আত্মকথা

বিজয়া চৌধুরী

অনুষ্টুপ

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এই বইতে যা বলা হয়েছে এবং আরও অনেক কথা যা অন্যত্র লিপিবদ্ধ সেসব কোনোটাই আমার কাছে অজানা নয়। আমাকে আমার মা সেই ছেলেবেলা থেকে আজ এই পর্যন্ত বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন প্রেক্ষিতে তাঁর জীবনের কথা বলেছেন। এসব তাঁর জীবনের গল্প, যে জীবনে জড়িয়ে আছেন অনেকেই, এমনকি শৈশবের আমিও। এর অর্থ এ নয় যে তিনি বসে বসে এই গল্পগুলো আমাকে শুনিয়েছেন। তাঁর নিজের জীবনের কথা বলার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। কখনও কখনও কোনো ঘটনা বা আলোচনার প্রেক্ষিতে তাঁর স্মৃতিতে এই গল্পগুলো জেগে উঠত, আর তিনি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমার বাবার কাছ থেকে যাচাই করে নিতেন। আমার বাবার বাল্যবন্ধু ছিলেন আমার মায়ের দাদা, ফলে আমার মায়ের বয়স যখন আট বছর তখন থেকেই তাঁদের পরিচয়। এ কারণে আমার মায়ের স্মৃতিকথার অনেক ক্ষেত্রেই হয় আমার বাবাও উপস্থিত থেকে গেছেন, কিংবা যেসব স্থান-কালের স্মৃতি মায়ের মনে ভেসে উঠেছে, সেগুলো আমার বাবার পরিচিত ছিল। কিংবা সেসব মানুষজনকে বাবা সরাসরি চিনতেন। এর ফলে ঘর সংসারের বিভিন্ন কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমার বাবার কাছ থেকে যাচাই করে মা তাঁর স্মৃতিকথাগুলো বলে যেতে পেরেছেন। মাঝে মাঝে এটা ভেবে তাই আমি খুব অবাক হয়ে যাই যে আমার বাবা-মা তাঁদের শৈশব থেকে একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত। তাঁরা সিলেটের মানুষ, যে দেশ আমার এখনও দেখা হয়নি, অথচ এই গল্পগুলোর মধ্যে দিয়ে তাঁদের দীর্ঘ জীবনের সঙ্গে আমিও যেন তৃতীয় একজন সঙ্গী হিসেবে জুড়ে আছি। এর ফলে আমার মায়ের স্মৃতিকথার মধ্যে ঢুকে গিয়ে আমারও মনে হয় আমিও যেন তাঁদের সমকালের মানুষ। তাঁদের সিলেটের সময়গুলোয়, কিংবা শিলং বা লন্ডনে আমিও তাঁদের সঙ্গে ছিলাম, এমনকি তাঁদের ছোটবেলাকার দিনগুলোয় আমিও ছিলাম ওঁদের মতো ছোটো।

এর ফলে আমার নিজের শৈশবের অর্ধেকটাই কল্পনার সেই সময়কার, শ্রীহট্ট বা সিলেট সেই দেশ, যা আমি কখনও দেখিনি, যেমন দেখিনি ১৯৫০ দশকের লন্ডন শহর, সেই লন্ডন যেখানে আমার বাবা ছিলেন ছাত্র, সেই শহর যেখানে আমার বাবা-মায়ের বিয়ে হয়, সেই স্থান আর কালগুলো যেন আমারও স্মৃতি। এসব মিলিয়েই আমার মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুভূতি কাজ করে। যেমন অল্প বয়সে যখন আমি এনসাইক্লোপিডিয়ায় প্রথম প্রাচীন রোম সম্বন্ধে পড়লাম, তখন আমার মাকে প্রশ্ন করি, 'তুমি যখন লন্ডনে ছিলে, তখন তুমি নিশ্চয় রোমান ছিলে?' অন্য ভাবে বলতে গেলে সেই ছোটো থেকে আমার মধ্যে অতীতের অতীতচারণ সম্বন্ধে কোনো ধারণা কাজ করে না। ফলে আমার মায়ের স্মৃতিকথাগুলো আমার কখনও অতীত বলে মনে হয় না, মনে হয় সবই যেন ঘটমান বর্তমান। আমার মনে হয় এই অতীতকে বর্তমানে রেখে নিবিষ্টভাবে দেখাটাই এই বই লেখার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে।

জীবন আমার মায়ের অনেক কঠিন পরীক্ষা নিয়েছে। আমার মনে হয় জীবনের প্রথমদিকে যদি আমার মায়ের ভাগ্য অনুকূল থাকত, তাহলে তাঁর যা মানসিক সাহস আর মেধা, তিনি সংগীত জগতে আরও বড়ো এক নাম হয়ে উঠতে পারতেন। তবে সেসব না পাওয়া নয়, বরং এই বইতে তাঁর ফুলের মতো ফুটে ওঠাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। যে ফুল কেবল নিজের জীবন ঘিরে নয়, আরও বহু মানুষ যাঁরা তাঁকে ঘিরে থেকেছেন তাঁদেরও কথা। এই বই আমার কাছে কেবলমাত্র একজন নারীর জীবনকথা নয়, বরং দীর্ঘ সময় জুড়ে বুনে চলা মানুষে মানুষে অন্তর্গত সম্পর্কের বয়ন, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সেই ভূগোল যা আজ দুরতিক্রম্য কিংবা হারিয়ে গেছে। ফলে এই বইতে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিংবা কম, অথবা ঘটনাগুলো জীবনের কেন্দ্রে, না পরিধিতে সে বিচারেরও কোনো অবকাশ থাকেনি।

অমিত চৌধুরী

এই ভূমিকাটি বিজয়া চৌধুরীর পুত্র এবং প্রখ্যাত লেখক অমিত চৌধুরীর ভূমিকা থেকে অনূদিত। অনুবাদ করেছেন দেবকুমার সোম।

সূচনাকথা

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গান: একটি ব্যক্তিগত প্রতিবেদন

মার্চ ২০১২-য় গানের জগতে বিরল, বিরল কেন, অলৌকিক এক কাণ্ড ঘটল। সেটি ঘটল আবার কলকাতা শহরে। ওইদিন, 'বিহান মিউজিক' প্রকাশ করে রবীন্দ্রসংগীতের একটি সিডি—এবং, দশখানি গানের সে সংকলনের প্রতি কটি পঁচাশি বছর পার এক শিল্পীর গাওয়া। সচরাচর, গাইয়েদের প্রতি বিশেষ নির্দয় কালপুরুষ—স্রেফ বয়সের ওজর খাটিয়ে সময়দেব, কণ্ঠঐশ্বর্যে ফতুর, একেবারে কাঙাল করে ছাড়েন স্বরসাধকদের। এই করুণ অথচ প্রায় অনিবারণীয় ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে, মধ্য-আশি এক মহিলার গলায় সুরে-তালে নির্ভুল, মীড়-মুড়কিতে সুললিত, বাণীর যুক্তিতে যাচাই-করা লয়-সঠিক গান শোনা, অভিজ্ঞতা হিসেবে চমকপ্রদ বই-কি। গায়িকা: বিজয়া চৌধুরী (জন্ম. ১৯২৫)। গায়ন তাঁর কেবল সুরেলা স্নিগ্ধতায় সীমিত নয়; তাঁর চেহারাও তা-ই—শান্ত, শীলিত প্রজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট বিজয়ার চলনে-বলনে। বোধহয়, ওই আত্মপ্রতিষ্ঠার সামর্থ্যগুণেই '(তোমার) ভুবনজোড়া আসনখানি' গানটি বিজয়া চৌধুরীর গলায় এত খুলেছে—যে-গান, ১৯১৬ সালে, সিঙ্গাপুর ছেড়ে হংকং যাওয়ার পথে চীনসাগরের উদ্দাম ভয়াল টাইফুন-ঝড়ের কবলে-পড়া টলোমলো জাহাজের ডেকে, কাঠরার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে বেঁধেছিলেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১); লস্কর-নাবিকের হৈ-হল্লা, বৃষ্টি-বাতাসের আওয়াজ ছাপিয়ে, যে-গানের প্রান্তিক দু-চরণে, পঞ্চান্ন বছরের কবি, দুর্যোগের

এক

আমার ফেলে আসা দিনগুলো—'ভরা থাক স্মৃতি সুধায়'। কিন্তু সব স্মৃতিই তো সুধায় ভরে থাকেনি আমার। স্মৃতির নদীতে জাল ফেলে দেখেছি আনন্দ আর দুঃখের কত টুকরো টুকরো ঘটনা। হয়তো-বা কত স্মৃতি হারিয়েও গিয়েছে সময়ের স্রোতে—তাকে ধরে রাখার চেষ্টা কেউ করে কি? এখন জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে মনে হচ্ছে হারিয়ে যাবার আগে সব স্মৃতিই কেন আমি কথার মালায় গেঁথে রাখব না? আমার এই স্মৃতিচারণ হয়তো-বা আমার পুত্র, আমার পুত্রবধূ, আমার ভবিষ্যৎ নাতি-নাতনির জন্য আনন্দের খোরাক হয়ে থাকবে। এই অকিঞ্চিৎকর মূল্যহীন জীবনের ঘটনাগুলো তাদের জন্য হয়তো অমূল্য হয়ে উঠবে। তখন আমার এ অনিপুণ হাতের লেখার অহেতুক প্রয়াস সার্থকতায় যাবে ভরে।

জন্ম হয়েছিল শিবসাগরে—আসামের একটা জেলা শহরে। আমার বাবা ছিলেন তখনকার দিনের বিশ্ববিখ্যাত খেতাবধারী ইঞ্জিনিয়ার—সেই সুবাদে বড়ো চাকুরেও—যাকে ব্রিটিশ আমলে বলা হত ইম্পিরিয়েল সার্ভিস। সাগর অথবা ঝিলের পারে আমাদের চমৎকার বড়ো বাংলো বাড়ি ছিল। বাবার ছিল ঘোড়ায় চড়ার শখ—আর সেই শখই হল আমাদের কাল—আনল প্রচণ্ড দুঃখ আমাদের জীবনে—আমার জন্মের অল্প দিন পরেই। শখ করে বাবা যে অস্ট্রেলিয়ান ঘোড়াটি কিনেছিলেন সেটি দেখতে নাকি বড়ো সুন্দর ছিল—গায়ের রং বাদামি আর দারুণ তেজি চেহারা ছিল তার। পায়ের খুরের কাছটা ছিল দুধের ফেনার মতো সাদা ধবধবে। তাই বাবা আদর করে তাকে ডাকতেন 'ফেনি'। ফেনিকে আমার একেবারেই মনে নেই, কিন্তু তাকে দেখেছি আমাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে তোলা গ্রুপ ছবিতে। সবার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা খাড়াই উঁচু তার চেহারা—পিঠে সওয়ার হয়ে বসে থাকা ছোড়দা।

ফেনির কথা এর বেশি আর কিছুই জানি না। কেননা আমাদের সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা জমজমাট সংগসারটি মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।

কত কথাই মনে পড়ছে—গ্রুপ ছবি তোলার প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত পরিবারে কিছুদিন পর পর ফোটোগ্রাফার ডেকে ছবি তোলার রেওয়াজ ছিল। আজকালকার আধুনিক লোকের মতো ঘাড়ে ক্যামেরা ঝুলিয়ে কেউ ঘুরে বেড়াত না। এখন কত আধুনিক সরঞ্জাম বেরিয়েছে—কতরকম দিশি-বিদেশি ক্যামেরা বাজারে এসেছে, যে-কোনো আনাড়িও চমৎকার ছবি তুলে নিতে পারে। আর তখনকার দিনে ফোটোগ্রাফারকে রণপার মতো উঁচু একটা তেপায়া কাঠের স্ট্যান্ড নিয়ে ঘুরতে হত, সঙ্গে থাকত তাদের নিজস্ব ফোটো তোলার যন্ত্র। সেই যন্ত্র অথবা ক্যামেরাটি ওই উঁচু কাঠের স্ট্যান্ডের উপর বসিয়ে তারা একটা কালো কাপড়ের ঘেরাটোপ দিয়ে মাথা ঢেকে ফোকাস ঠিক করে নিত। ফোটো তোলার দিন তার আয়োজন চলত সারাদিন ধরে। প্রথমত, সকলেই যার যার সর্বোৎকৃষ্ট জামাকাপড় পরে নিত। জামার রং গাঢ় থাকাটাই বাঞ্ছনীয় ছিল। হালকা রং-এর জামাকাপড় পরে ছবি ভালো হয় না—এই ধারণা থাকার ব্যাপারে আজকালকার আর তখনকার লোকের মধ্যে মতের কোনো পার্থক্য ছিল না। মা পরতেন গাঢ় নীল রঙের নীলাম্বরী শাড়ি। নীলাম্বরী শাড়ি পরেই সাধারণত মাকে সাজতে হত ছবি তোলার জন্য। সারি সারি চেয়ারে সবাই বসত। দাদারা সবাই পায়ে জুতো-মোজা আলপাকা কাপড়ের পোশাক পরে সেজেগুজে বসত, আর মাঝখানে বসতেন মা আর বাবা। একপ্রান্তে আমাদের ঘোড়া ফেনি—তার উপর ছোড়দা, আর অন্য কোনায় আমাদের পুরোনো ভৃত্য লক্ষ্মণ। বাবার পরনে হাফ-হাতা শার্ট, হাফপ্যান্ট—আজকাল আমরা যাকে শর্টস বলি, মাথায় শোলার টুপিটা কোলের উপর অবহেলায় রেখে দেওয়া। বাবার এই চেহারা আমি অনেক ছবিতে দেখেছি। আর মায়ের সেই শান্তশ্রীর বর্ণনা এই লেখনীতে ফুটবে কি? তার ঢলঢলে মুখে ছিল দুটি বড়ো বড়ো চোখের অদ্ভুত শান্ত দৃষ্টি—সম্পূর্ণ মাতৃত্ব দিয়ে ভরা সেই চোখের চাউনি। মাঝখানে সিঁথি কাটা, কপালের কাছে অল্প অল্প ঢেউ তোলা চুল খোঁপায় বাঁধা। গায়ে কনুই পর্যন্ত লম্বা চৌকো গলার জ্যাকেট অথবা ব্লাউজ,